রাজশেখর বসু

দেবাশিস ভৌমিক

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

।। লেখকের নিবেদন ।।

বিজ্ঞানের মানুষ, অথচ বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিঃসংকোচ গতায়াত খুব একটা যে দুর্লভ এমন কথা বলি না। তেমন নাম কেবল বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যেই অল্পবিস্তর হলেও খুঁজে পাওয়া যাবে। আসলে সাহিত্যকে লিখিত চেহারায় পাঠকের হাতে তুলে দেবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের মানুষজনের মধ্যে যে যথেষ্টই থেকে থাকে তার প্রমাণ দেবার জন্যে প্রচুর গলদঘর্ম হবার আবশ্যকতা নেই। আবার, এও দেখা যায়, একজন মানুষ একই সঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণাগারে যেমন স্বচ্ছন্দ ঠিক তেমনি অনুভূতিশীল সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ কাগজ কলমে। এ দুয়ে তো কোনো বিরোধ নেহ-ই বরং বলা ভালো যে, কোনো বিজ্ঞানের মানুষ সাহিত্য করবেন বলে যদি সাহস দেখাতে পারেন, তবে সফলতা পাবার সম্ভাবনা খুব বেশি পরিমাণে তৈরি হয়। তার কারণ হল, হৃদয়-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে যদি বাস্তব ঘটনাক্রমের কার্যকারণ সূত্রকে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নিয়ে ফেলা যায় তবে তার আলোকস্ফূরণ ছড়িয়ে পড়ে ক্ষিতি থেকে ব্যোম পর্যন্ত। আর সেই ম্যাজিক এর কাজটিই করে দেখিয়েছিলেন রাজশেখর বসু। ওরফে পরশুরাম। খ্যাতিমান এই মানুষটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গিয়েছিল, কোনো রকম পৌরাণিক মাহাত্ম্যের মিল থাকায় তিনি এমন একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেননি। যে পাড়ায় থাকতেন সেখান পরশুরাম কর্মকার নামে একজন নাকি মাঝে মধ্যে লেখকের বাড়িতে আসতেন। গল্প লেখবার সময় কী ছদ্মনাম দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে এই পরশুরামের নামটিই তুলে নিলেন যত্ন করে। না, রাজশেখর বসুর ক্ষেত্রে এ নামের স্বতন্ত্র কোনো কারণ ও ঐতিহ্য খুঁজতে গেলে পণ্ডশ্রম করা হবে।

রাজশেখর বসুর পৈতৃক ভিটে নদিয়া জেলার উলা বীরনগরে। জন্ম তারিখ ১৬ মার্চ ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। তাঁর চারপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন রাজশেখর। তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কেউকেটা মানুষ হয়তো ছিলেন না চন্দ্রশেখর। কিন্তু সামান্য ডাকবিভাগের একজন কর্মচারী হিসেবে সেই সময় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বিষয়ে তিনি একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন। সেটির ওপর ভিত্তি করেই কলকাতায় ইন্ডিগো কমিশনের তদন্তের কাজ চলে। চন্দ্রশেখর তখন বাংলাদেশের (এখনকার) যশোরে রয়েছেন। চন্দ্রশেখর বসু সামান্য চাকরি করলেও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা বেরোত। লেখক পরিচিতি থেকেই পরবর্তীতে তিনি দ্বারভাঙার মহারাজের ম্যানেজার পদে বহাল হয়ে দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে কাটান। যাইহোক, সেইসূত্রে রাজশেখরের ছেলেবেলাও কেটেছে বাংলার বাইরে। দ্বারভাঙার রাজস্কুল থেকেই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর পাটনা কলেজে আর্টস নিয়ে ভরতি হন। সেখানে পড়া শেষ করে ১৮৯৭ সালে রাজশেখর চলে এলেন কলকাতা। ভরতি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এবারের বিষয় বিজ্ঞান। এই সময় রাজশেখরের বয়স সতেরো। পরিবারের সিদ্ধান্তে সতেরো বছরের যুবক এবার বিবাহের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হল। শ্যামচরণ দে'র নাতনির সঙ্গে এই বছরই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল রাজশেখরের। পড়াশোনা আর সংসারজীবন চলল সমান্তরাল গতিতেই। তখনকার দিনে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলে এম এস সি বলা হত না, বলা হত এম এ। ১৯০০ সালে রাজশেখর রসায়ন নিয়ে এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেলেন। পরিচয় দিলেন স্বীয় মেধাশক্তির। কিন্তু তখনকার দিনের একটা রেওয়াজ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত পড়াশোনা শেষ করে তাকে আইন পড়তে হত। অনেক বড়োবাড়ির ছেলেরা এই আইন পড়তে বিলেতেও পাড়ি দিতেন। রাজশেখর ভর্তি হলেন আইন কলেজে। দু'বছর পড়াশোনা করে পাশও করে গেলেন।

কিন্তু আইনজ্ঞের চোগা-চাপকান একেবারে না-পসন্দের বিষয় হয়ে উঠছিল রাজশেখরের কাছে। এককথায় ছেড়ে দিলেন আইনব্যাবসা। দায়মুক্তি ঘটল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন রাজশেখর। এত এত হাসির গল্প লিখেছেন যে মানুষটি, খুব জানতে ইচ্ছে করে, আসলে মানুষটি ছিলেন কেমন! বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, রাজশেখর বসুর মতো সৎ, ভদ্র, শান্ত সংযত মানুষ সত্যিই বড়ো একটা চোখে পড়বার নয়। রাজশেখর বসু অত্যন্ত অন্তর্মুখী সত্তা নিয়ে চলতেন। নিজেকে কোনোদিন বিজ্ঞাপন করে তুলতে চাননি। কর্মজীবনে সাহচর্য পেয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। বেঙ্গল কেমিক্যালের দায়ভার রাজশেখরের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ১৯০৬ থেকে ১৯৩২—সুদীর্ঘ সময় স্বীয় কর্মতৎপরতা ও উদ্ভাবনীশক্তি দিয়ে রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। অন্তর্মুখীন এই মানুষটি কিন্তু কখনো কখনো বেরিয়ে পড়তেন নিজের খোলস ছেড়ে। সাহিত্যচর্চা, আড্ডা গান এসব ভীষণ ভালোবাসতেন রাজশেখর। তাঁর উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। ঠিকানা ১৪নং পার্শীবাগান লেন। এটাই ছিল রাজশেখরের পৈতৃক নিবাস। ডাক্তার, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক—কে আসতেন না সেখানে আড্ডা দিতে! সেই মজলিশে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে চলত বিজ্ঞান, মনস্তত্ব, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং অবশ্যই সাহিত্য নিয়ে নানা উত্তপ্ত আলোচনা। উৎকেন্দ্র সমিতির যাঁরা সভ্য ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে আসলে উৎকেন্দ্র সমিতির প্রাণভোমরাটি লুকিয়ে ছিল। শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নরেন্দ্রনাথ বসু, ড. সুহৃদচন্দ্র মিত্র। অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ড. দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—এমন হাজারো নাম এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর কেজো জীবনের বাইরে রাজশেখর বসুর ভিন্ন যে পরিচয় ছিল তাকে তিনটি পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত তিনি ছিলেন অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষ। উইট, স্যাটায়ার, হিউমারকে সঙ্গী করে সাহিত্যের পাতায় কী অবাধে বিচরণ করা যায় এঁকে না দেখলে তা বোঝা যাবে না। দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন একজন সফল অনুবাদক। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতাকে বঙ্গানুবাদ করেছেন চলিত বাংলা গদ্যে—এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। লিখেছেন 'চলন্তিকা'র মতো একটি অসাধারণ অভিধান গ্রন্থ। এটি তাঁর প্রতিভার তৃতীয় কক্ষ। এমন একজন প্রতিভাধর মানুষ বাংলা সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন আমৃত্যু। দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রতিটি ইংরেজি বস্তুনামকে বদলে নাম দিয়েছেন বাংলায়। শিশুর মতো অমলিন এই বঙ্গভাষা-প্রীতি রাজশেখর বসুকে শুধু যে যুগে নয়, আজও বাঙালি পাঠকের আপনজন করে রেখেছে। যোগাযোগ ছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। একাধিকবার কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে গেছেন সপরিবারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন রাজশেখরকে, তেমনি রাজশেখর বসুও সমালোচনা লিখেছিলেন কবির লেখা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের। সম্মানও কম পাননি জীবনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট পদ্মভূষণ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার—সবকিছুই তাঁর প্রাপ্তির ভাণ্ডার ষোলো আনা পূর্ণ করে রেখেছিল। কিন্তু তবুও বলব, এই সম্মান রাজশেখর বসুর মতো বিরল প্রতিভাধর মানুষের জন্য হয়তো যথেষ্ট নয় মোটেই। রাজশেখর বসু ছিলেন অন্য মনের মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ—এসব যেমন তাঁব বেঙ্গল

কেমিক্যাল এর কর্মজীবনকে সাফল্য দিয়েছে, তেমনি তাঁর রসবোধ, সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য, পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁকে করে তুলেছে বিরল সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। এই দ্বৈতরথে উড্ডীন রাজশেখর-এর জীবন ও কৃতি নিয়েই আমার এই ছোট্ট প্রয়াস—রাজশেখর বসু।

গ্রন্থতীর্থের প্রাণ পুরুষ, নতুন নতুন বইয়ের নেশায় পাগল একটি মানুষের প্রতিনিয়ত অনুরোধ ফেলতে পারিনি। তিনি স্বয়ং শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক মশাই। তাঁর ইচ্ছেতেই এ বইয়ের অক্ষরগুলি পাণ্ডুলিপির অন্ধকার কক্ষ থেকে বাইরের আলো দেখবার সুযোগ পেয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। আমার এই প্রয়াসটি সংক্ষিপ্ত হলেও এ কাজে সাহায্যও পেয়েছি আমার স্ত্রী শ্রীমতী চৈতালি ভৌমিকের কাছে। লেখবার অবকাশ তৈরি করে দেবার পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁরই। কন্যাদ্বয় কুর্চি আর কৃতির মুহুর্মুহু জিজ্ঞাসা আর কদ্দুর? তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। তাদের এই অদৃশ্য কৌতূহল আমার লেখার গতি ত্বরান্বিত করেছে বই নয়। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে মাঝে মাঝেই আগ্রহ দেখিয়েছেন কালিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক মিত্রকুল। তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার লেখা অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ গ্রন্থগুলির মতো এখানেও রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন থেকে শিরোনাম চয়ন করেছি। সব মিলিয়ে বইটি পাঠকের ভালো লাগলে ভীষণ কৃতজ্ঞ বোধ করব তাঁদের কাছে।

১ বৈশাখ ১৪২২

অধ্যাপক দেবাশিস ভৌমিক
বাংলাবিভাগ, কালিয়াগঞ্জ কলেজ

সূচিপত্র

- আজি যত তারা তব আকাশে ১৫
- আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি ১৯
- সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে ২৪
- কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই ২৭
- রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি ৩২
- গেল দিন ধরা মাঝে কতভাবে কত কাজে ৩৬
- অজানা খনির নতূন মণির গেঁথেছি হার ৪৩
- তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে ৪৯
- আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল ৫৩
- হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা ৫৮
- এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে ৬৮
- ওরে চিত্ররেখা ডোরে বাঁধিলে কে ৭৫
- মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল ৮৪
- আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাবো ৮৯
- যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে ৯৪
- হে মহাজীবন হে মহামরণ, লইনু শরণ লইনু শরণ ১০০
- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১০৬

।। আজি যত তারা তব আকাশে ।।

ইতিহাসেরও একটা ইতিহাস থাকে। জীবনের সূত্র খুঁজতে খুঁজতে উৎসুক গবেষকের চোখ যে কোন্ সুদূর অতীতলোকের দিকে ছুটে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না। কিন্তু তাঁর এই পাগলপারা ছুটে চলার বাঁকে বাঁকে জমা হয় ইতিহাসের কত অজানা কথা, অনালোকিত অতীতের আলোকবিচ্ছুরণ। চন্দ্রশেখর বসু নামক জনৈক যুবাপুরুষের জীবনে এমন বিচিত্র চিত্তবিক্ষেপ ঘটেছিল বলেই হয়তো অতীতচারণাকে কেন্দ্র করে একের পর এক বাক্যবন্ধ নির্মাণ করা সহজ হয়ে ওঠে। একদা নদিয়া জেলায় 'উলা' নামে একটি গ্রামের বেশ নামডাক ছিল। এমন বিচিত্র গ্রামনামের প্রকৃত উৎস প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া না গেলেও অনুমান করা হয়ে থাকে, নদিয়া জেলার একটি অংশে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ পরিপূর্ণ ছিল উলুঘাসে, সেখান থেকেই উলাগ্রাম চিহ্নিত হয়েছে। তবে ধর্মপ্রবণ আঞ্চলিক অধিবাসীদের মত ছিল ভিন্ন, তাঁরা মানে করতেন উলাচণ্ডীর পুজো হত এই ছোট্ট এলাকাটিতে। সেখান থেকেই গ্রামের নাম উলা গ্রাম। স্থান নাম যাই হোক, এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটি ছিল নদিয়া জেলার একটি বর্ধিষ্ণু ও প্রাচীন জনপদ। বর্তমানে জায়গাটির নাম বীরনগর। বীরনগর নামকরণের নেপথ্যেও একটি মজার গল্প আছে। অনেককাল আগে একবার এই উলাগ্রামে নাকি ডাকাত পড়েছিল। তবে ডাকাত পৌঁছোবার আগেভাগেই সে কথা পৌঁছে গিয়েছিল উলাগ্রামের বাসিন্দাদের কাছে। নানা কৌশলে এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে ডাকাতদের সেদিন শায়েস্তা করে দিয়েছিল উলার গ্রামবাসীরা। ডাকাতদের মধ্যে অনেকে ধরাও পড়ে যায়।

জানা যায় এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে তোলবার জন্য গ্রামবাসীদের তরফ থেকে একটি প্রস্তাব ওঠে। উলাগ্রামের নাম হোক বীরনগর। কারণ এ গ্রামের বাসিন্দাদের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে গ্রামের নামটিতে একটা বদল চাইলেন সকলেই। তৎকালীন সরকার গ্রামবাসীদের দাবি মেনে নিয়ে গ্রামের নাম পালটে রাখলেন বীরনগর। সৃজননাম মিত্র মুস্তৌফির লেখা 'উলা বা বীরনগর' গ্রন্থে এই তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। সরকারি সুপারিশ প্রসঙ্গে সেখানে লেখা আছে— "The name of the village should be changed to Beernagar, that is the town of heroes." চন্দ্রশেখর বসুর জন্মস্থান বীরনগর বা উলাগ্রাম সম্পর্কে এই সব গালগল্প আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে।

রাজশেখর বসুর পিতা চন্দ্রশেখর বসু সম্পর্কে অনেক কথাই পাওয়া গেছে বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, এ গ্রন্থের সম্পাদক যিনি ছিলেন,'বঙ্গবাসী' পত্রিকারও সহকারী সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর নাম হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, সেই গ্রন্থে চন্দ্রশেখর বসু প্রসঙ্গে বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য যেমন—"১২৪০ সালের ৮ শ্রাবণ, জেলা নদিয়ার উলাগ্রামে চন্দ্রশেখর বসুর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস বসু এবং কৌলিন্য পর্যায় পঁচিশ। ইঁহারা মাইনগর নিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে উলার মুস্তৌফি বাটীতে বিবাহ করেন। তৎকালে মুস্তৌফি বংশ মহাপ্রতাপান্বিত ছিল। তাঁহারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে 'মুস্তৌফী' খেতাব পাইয়া ছিলেন। উক্ত বিবাহ উপলক্ষ্যে মুস্তৌফীদিগের স্টেট হইতে ভূম্যাদি সম্পত্তি পাইয়া চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি তাঁহাদের ভবনে বাস করেন এ পর্যন্ত সেখানেই চন্দ্রশেখর স্বীয়বংশের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত

রাখিয়াছিলেন।" ইতিহাসের ইতিহাস তৈরি হওয়ার গল্প এভাবেই তৈরি হয়।

'উলা' গ্রামের বসু পরিবারের উৎপত্তির ইতিহাস প্রসঙ্গে আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় চন্দ্রশেখর বসুর লেখা 'ধবু বসু বংশ পত্রিকা' নামে একটি ছোটো পুস্তিকায়। সেই ঠিকুজি-কুলজি সংগ্রহে চন্দ্রশেখর নাকি প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। এমন মূল্যবান একটি কুলজিগ্রন্থ নির্মাণের পর চন্দ্রশেখর সমস্ত আত্মীয়স্বজনের হাতে সেই পুস্তিকাটি তুলে দেন উপহার হিসেবে। নানা গবেষণায় চন্দ্রশেখর নিজের বংশোৎপত্তি প্রসঙ্গে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন তার কতকটা এখানে তুলে ধরা যাক। যেমন চন্দ্রশেখরের উপস্থাপিত ঐতিহাসিক বিষয়গুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে কায়স্থদের স্থান, কান্যকুব্জ থেকে রাজা আদিশূরের পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থকে এই বাংলায় আনয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এর পাশাপাশি চন্দ্রশেখর লিখেছেন নিজের বংশের বিস্তৃতি প্রসঙ্গ,বংশপরিচয় ইত্যাদি খুঁটিনাটি নানা কথা। আত্মীয় স্বজনদের হাতে এই পুস্তিকাটি উপহার হিসেবে তুলে দিয়ে চন্দ্রশেখর অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন স্ব-জাতীয় কায়স্থদের অন্যান্য শাখার বিবরণ সংগ্রহে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। চন্দ্রশেখর বসুর লেখা 'ধবু বসু বংশ পত্রিকা' থেকে সেই বংশের উৎপত্তি বিষয়ক কয়েকটি অংশ এইরকম—

এক '... আমার পিতাঠাকুর ঁকালিদাস বসু... আমার বাল্যকালে আমাকে পূর্বপুরুষের নামগোত্র, পর্যায়ভাব প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন।'

দুই 'গৌড়দেশস্থ ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ বংশের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ বিষয়ক কিছু কিছু সংবাদ অবগত হওয়া প্রয়োজন।'

তিন 'মহারাজ আদিশূর বর্ষানুষ্ঠান নামক রাজসূয় যজ্ঞের

সংকল্পপূর্বক কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহকে পঞ্চগোত্রের সস্ত্রীক পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ পাঠাইতে লেখেন। তদনুসারে পঞ্চজন সর্ব্বশাস্ত্র দক্ষ শ্রুতিজ্ঞ, সুগতজীত পঞ্চগোত্রীয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন পঞ্চগোত্রীয় যাজ্ঞিক কায়স্থ সদারাপত্য প্রেরণ করেন।'

চার 'ধবু বসুর (ধ্রুব বসু ?) যে বংশাবলী আমি পশ্চাতে লিখিতেছি তাহা আমার প্রপিতামহের (রত্নেশ্বর বসু) সংগৃহীত।'

এই তথ্যগুলি থেকে উলাগ্রামের বসু পরিবার সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে এখানে উল্লেখ করা খুব জরুরি যে রাজশেখর বসু ছিলেন এই বংশের ছাব্বিশতম সন্তান। আর এসব তথ্য অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি না রাজশেখরের পিতা তাঁর নিরলস গবেষণার মধ্যে দিয়ে এমন একটি কুলজিগ্রন্থ নির্মাণ করতেন। রাজশেখর বসুর জন্ম ইতিহাস ও তার উৎস খুঁজতে গেলে এই গঙ্গোত্রী বা গোমুখের সামনে দাঁড়াতেই হবে। সেখানে রাজশেখর বসুর জন্মক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে এইভাবে —দ্বিতীয়পুত্র, জন্ম ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, ৪ চৈত্র (ইং ১৬ মার্চ ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে) মঙ্গলবার, রাত্রি ২৪ দণ্ড। রাজশেখর বসু কোষ্ঠীবিচার করতে শিখেছিলেন পরিণত বয়সে। নিজের জন্মকোষ্ঠী বিচার করে তিনি তাঁর ইংরেজি জন্মতারিখটি মেনে নেননি। তাঁর হিসেবে এই তারিখটি হওয়া উচিত ১৮ মার্চ, ১৬ মার্চ নয়। দীপংকর বসুর লেখা অপ্রকাশিত রাজশেখর গ্রন্থে এই তথ্যটির উল্লেখ রয়েছে। যাইহোক, শুরুরও একটা শুরু থাকে। সেখান থেকেই এবার শুরু করা যাক।

।। আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি ।।

যতদূর জানা গেছে চন্দ্রশেখর বসু তিনবার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। প্রথম দুই স্ত্রী ছিলেন স্বল্পজীবী। প্রথম স্ত্রীগত হন নিঃসন্তান অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীও বেশিদিন বাঁচেননি। এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েই তিনি সংসার ছেড়ে চলে যান। তবে চন্দ্রশেখরের ততীয় স্ত্রী দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। তৃতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করবার সময় চন্দ্রশেখর বছর তিরিশের যুবক। চন্দ্রশেখরের শ্বশুরালয় ছিল বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রাম। এই গ্রামেরই নৃত্যগোপাল দত্ত ও জগমণি দত্তের কন্যা লক্ষ্মীমণিকে বিবাহ করেন চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর ও লক্ষ্মীমণি ছিলেন সর্বমোট নটি সন্তানের জনক জননী। এঁদের মধ্যে ষষ্ঠসন্তান ছিলেন রাজশেখর বসু। বাকি সন্তানদের নাম ইন্দুমতী, কুমুদবতী, শশিশেখর, উষাবতী, লীলাবতী, হিরণ্যবতী, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর।

রাজশেখর বসু তাঁর একটি লেখায় চন্দ্রশেখর বসু সম্পর্কে একটি মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই ঘটনা থেকে দুটি তথ্য উঠে আসবে। প্রথমটি হল পিতা সম্পর্কে রাজশেখর বসুর মনোভাব এবং দ্বিতীয়টি হল রাজশেখর বসুর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে অনেক না-জানা তথ্য। সেই লেখাটিতে রাজশেখর বসু অতীতচারণা করছেন এইভাবে—ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করছি। বাবা প্রশ্ন করলেন—

কী বই পড়ছ? উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

—কোন খানটা?

—মোগল সম্রাটদের বংশ। বাবরের পুত্র হুমায়ুন, তাঁর পুত্র আকবর, তারপর জাহাঙ্গির শাজাহান আরংজিব।